

১২ FEB ২০১৭
পৃষ্ঠা ৮



মাছুম বিল্লাহ ▽ বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন নিয়ে কিছু কথা //

একজন পরীক্ষক যিনি জীবনে প্রথমবার পরীক্ষক হয়েছেন কিংবা তিনি তত সিনসিয়ার নন কিংবা নম্বর দিতে উদারতা প্রকাশ করেন কিংবা নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃপণ ইত্যাদি বিষয়ের যেকোনো একটিও যদি মূল্যায়নের ওপর প্রভাব ফেলে, তাহলে একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কখনো সঠিক হয় না। অথচ এই নম্বর প্রদানের ওপর নির্ভর করছে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা, চাকরি, বিদেশে যাওয়া, তার সারা জীবনের একটি প্রাপ্তি। সেটি কোনোক্রমেই একজন শিক্ষকের মতামতের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। মূল্যায়ন হতে হবে সঠিক আর তা করার জন্য কমপক্ষে দুজন পরীক্ষক থাকতে হবে। প্রথম পরীক্ষক লাল কালি দিয়ে ভুলত্রুটি শনাক্ত করবেন এবং খাতায় নম্বর না দিয়ে আলাদা একটি শিটে গোপনে নম্বর প্রদান করবেন

বোর্ড পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণ নিয়ে একটি জাতীয় দৈনিকে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দেখলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল নিজ শিক্ষকতা জীবনে বোর্ড পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণ নিয়ে প্রত্যক্ষ করা কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা। ১৯৯১ সালে প্রথম ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষক হয়েছিলাম এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহ বোর্ড অফিসের সম্মেলন কক্ষে খাতা পরীক্ষণবিষয়ক একটি সভায় যোগদানের জন্য সকাল সাড়ে ৮টায় উপস্থিত হয়েছিলাম। সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল সকাল ৯টায়। সকাল সাড়ে ৮টায় বোর্ডে পৌছলাম, যাতে কোনো কিছু মিস না করি। সকাল সাড়ে ৮টা তো দূরের কথা, সাড়ে ৯টায়ও কেউ সেখানে আসেননি, না বোর্ডের কোনো লোক, না কোনো পরীক্ষক। ১১টার আগে আগে দেখলাম কয়েকজন পরীক্ষক হাতে একটি করে চটের বস্তা নিয়ে সভাকক্ষে ঢুকছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ১২টার দিকে এসে একটি বক্তব্য দিলেন। বক্তব্যের পরপরই কিছু শিক্ষক আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'গতবারের বিল এখানে পাইনি, এবার খাতা নেব না।' শুরু হয়ে গেল বাগবিতণ্ডা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বোর্ডের সীমাবদ্ধতার কথা ব্যাখ্যা করলেন। আরেকবার ঢাকা বোর্ডের খাতা নেওয়ার সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। এক শিক্ষক খাতার বস্তা গাড়িতে রেখে অসুস্থতার কারণে বাসায় চলে গেছেন। একজন শিক্ষক পরীক্ষার খাতা নিয়েছেন। তারপর তিনি ভারতে চলে গেছেন। জীবনে আর ফেরেননি। এক পরীক্ষক তাঁর খাতা নিয়ে লঞ্চে যাচ্ছিলেন, লঞ্চডুবি হওয়ায় খাতা আর পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে বোর্ড নিয়ম করেছে টেস্ট পরীক্ষার নম্বর বোর্ডে জমা দেওয়া, যাতে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে বোর্ড থেকে শিক্ষার্থীকে নম্বর দেওয়া যায়। একজন পরীক্ষক তাঁর কাজের মেয়ের দ্বারা পুরো ওএমের শিট পূরণ করিয়েছেন, যিনি প্রতিটি ঘরই কালি দিয়ে পূরণ করে দিয়েছেন, পরে কাদতে কাদতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে এসেছিলেন। এক পরীক্ষকের কাছে শিক্ষার্থী পেয়েছে ৮২, ঘর পূরণ করা হয়েছে ২৮। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। শিক্ষার্থীর কাল্লা, অভিভাবকদের কাল্লা, দুই মাস অপেক্ষা ও খাতা পুনর্মূল্যায়নের পর দেখা গেল শিক্ষার্থীর অরিজিনাল নম্বর ৮২। আমার দেখা আরেক পরীক্ষক এক হাজার খাতা নিয়ে উধাও। বোর্ডের রেজাল্ট তৈরির সময় হয়েছে কিন্তু ওই পরীক্ষকের খাতা ও পরীক্ষক-কাউকেই পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করিয়ে কিছু খাতা উদ্ধার করা হয়েছিল। আর একবার কুমিল্লা বোর্ডের খাতা আনতে গিয়ে সবাই যখন বিদ্রোহ করলেন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তখন হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বললেন যে 'আপনারা এখানে আসুন, দেখুন কত কঠিন এই চেষ্টা। আপনারা দয়া করে খাতা নিয়ে যান, এটি আপনারদের পবিত্র জাতীয় দায়িত্ব। আপনারা সবচেয়ে বড় বিচারক।' তখন সবাই

উত্তেজিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হয়ে খাতা নিলেন। বোর্ড পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এত বছর পরও খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। আমরা অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক হয়েছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে উন্নতি হয়নি। পত্রিকা মারফত জেনেছি যে একজন পরীক্ষককে প্রথম দফায় ১০০টি খাতা দেওয়া হয়েছিল। সহানুভূতির সঙ্গে খাতা দেখে মুক্তহস্তে নম্বর দেওয়ার পরও এর মধ্যে দুজন ফেল গেল। বিষয়টি প্রধান পরীক্ষককে জানানোর পর তিনি বলেন, যেকোনোভাবেই হোক ওই পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে দিতে হবে, তা না হলে তাঁদের দুজনকেই নাকি শাস্তি পেতে হবে। তাঁদের কেন শাস্তি পেতে হবে এবং কে শাস্তি দেবেন? কোথা থেকে এই কথা আসে সেগুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমার আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এক বছর আমরা সব ইংরেজি শিক্ষক এক হাজার করে খাতা পেলাম। আমার এক সহকর্মীও এক হাজার খাতা পেলেন। তিনি পুরো খাতাই তাঁর স্ত্রীর দ্বারা দেখিয়েছেন। উল্লেখ্য, তাঁর স্ত্রী ওই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং ইংরেজিতে ফেল করেছিলেন। অথচ তাঁর দ্বারাই পুরো খাতা মূল্যায়ন করিয়েছিলেন তিনি। ওই সহকর্মী অন্য কাজে যেহেতু ব্যস্ত, তিনি খাতা দেখার সময় পান না। তাঁর যুক্তি ছিল নম্বর বেশি বেশি দিতে হবে, তাহলে কোনো খামেলা নেই। কারণ কারোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু নম্বর কম দিলে খামেলা। বিষয়টি এখন দেখি অফিশিয়ালিই হয়ে গেছে। একজন পরীক্ষক যিনি জীবনে প্রথমবার পরীক্ষক হয়েছেন কিংবা তিনি তত সিনসিয়ার নন কিংবা নম্বর দিতে উদারতা প্রকাশ করেন কিংবা নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃপণ ইত্যাদি বিষয়ের যেকোনো একটিও যদি মূল্যায়নের ওপর প্রভাব ফেলে, তাহলে একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কখনো সঠিক হয় না। অথচ এই নম্বর প্রদানের ওপর নির্ভর করছে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা, চাকরি, বিদেশে যাওয়া, তার সারা জীবনের একটি প্রাপ্তি। সেটি কোনোক্রমেই একজন শিক্ষকের মতামতের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। মূল্যায়ন হতে হবে সঠিক আর তা করার জন্য কমপক্ষে দুজন পরীক্ষক থাকতে হবে। প্রথম পরীক্ষক লাল কালি দিয়ে ভুলত্রুটি শনাক্ত করবেন এবং খাতায় নম্বর না দিয়ে আলাদা একটি শিটে গোপনে নম্বর প্রদান করবেন। দ্বিতীয় আরেকজন পরীক্ষক নীল কিংবা সবুজ কালি দিয়ে দিয়ে ভুলত্রুটি নির্ণয় করে নম্বর প্রদান করবেন। দুই পরীক্ষকের নম্বর প্রদানে যদি বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তখন তৃতীয় একজন পরীক্ষক ওই খাতা মূল্যায়ন করবেন। পরিশেষে ট্যাবুলেশনের মাধ্যমে সব নম্বরের গড় করতে হবে। প্রথম পরীক্ষক যখন জানবেন যে তাঁর দেখা খাতা অন্য আরেকজন পরীক্ষক মূল্যায়ন করবেন, তিনি তখন সতর্কতার সঙ্গে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। এতে সময় একটু বেশি লাগবে কিন্তু মূল্যায়ন হবে অনেকটাই সঠিক। কেউ আর মূল্যায়ন নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন না। তাই

পরীক্ষকদের কমসংখ্যক খাতা দিতে হবে, সম্মানী বেশি দিতে হবে। এখন যে দ্রুততার সঙ্গে খাতা দেখা হয় ও একজন অনভিজ্ঞ পরীক্ষকও যেনতেন প্রকারে নম্বর প্রদান করেন। কারণ তিনি জানানোর তাঁর এই খাতা আর কেউ দেখাবেন না। প্রধান পরীক্ষকরা খাতায় শুধু স্বাক্ষর করেন, যারা একটু বেশি সিনসিয়ার তাঁরা কেউ হয়তো ১০ শতাংশ খাতা আরেকবার দেখেন। বাকি ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীর খাতা মূল্যায়নের কী হবে? তাঁকে যারা সহায়তা করেন তাঁরা শুধু নম্বর গুনে দেখেন, টপশিটের নম্বর আর খাতার ভেতরের নম্বর ঠিক আছে কি না। প্রধান পরীক্ষক পদটি না রেখে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষক নিয়ম চালু করলে মূল্যায়ন অনেকটাই সঠিক হবে। একজন শিক্ষকের যেনতেন প্রকারে ও দ্রুততার সঙ্গে খাতা মূল্যায়ন করা মানে একটি জাতীয় শিক্ষান্ত দেওয়া, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও প্রযোজ্য। অনভিজ্ঞ, নতুন কিংবা একজন খোয়ালি শিক্ষকের মূল্যায়ন কখনো সঠিক হতে পারে না। হচ্ছেও না। কাজেই এই পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিষয় শিক্ষকরা ব্যতিক্রম ছাড়া নিজেদের বিষয়ের বাইরে যেতে পারেন না, অনেক উচ্চমানের খাতা তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা মূল্যায়ন করতে পারেন না। এ অভিজ্ঞতা আমি ক্যাডেট কলেজে শিক্ষকতা করার সময় প্রত্যক্ষ করেছি। কাজেই প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পরীক্ষকের মধ্যে শিক্ষকদের বাইরে শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন তাঁদেরও খাতা মূল্যায়ন কাজে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাড়াহুড়া করে ফল বের করার মধ্যে কোনো ফ্রেডিট নেই, বরং সঠিক ফল তৈরি করার মধ্যেই প্রকৃত ফ্রেডিট। বর্তমানে যে প্র্যাকটিসটি আছে তা হচ্ছে একজন পরীক্ষককে ৪০০ থেকে ৫০০ খাতা দেওয়া হয় এবং সময় দেওয়া হয় ১৫-১৬ দিন (২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে)। একটি খাতা ভালো করে পড়ে, ভুলত্রুটি নির্ণয় করে মূল্যায়ন করতে একজন ছাত্র ১৮০ মিনিটে যা লেখে তার ১০ ভাগের ১ ভাগ সময় নিয়ে বিচার করলেও ১৮ মিনিট করে লাগার কথা। আনুষঙ্গিক কাজ যেমন গণনা করা, টপশিটে নম্বর তোলা, বৃত্ত ভরাট করা আরো দুই মিনিট। এভাবে একজন পরীক্ষকের এক ঘণ্টায় তিনটির বেশি খাতা মূল্যায়ন করার কথা। তাঁর অন্যান্য কাজ অফিস, বাড়ি, সামাজিকতা, ব্যক্তিগত ঘুম, বিশ্রামের হিসাব নিলে একজন পরীক্ষকের ১৫-১৬ দিনে কিংবা এক মাসে কতটি খাতা প্রকৃতভাবে মূল্যায়ন করার কথা, তা আমরা কখনোই ভেবে দেখি না। শুধু দ্রুত ফল প্রকাশ করে সন্তোষ প্রকাশ করি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এসবের পরিবর্তন হওয়া জরুরি।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত
সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক
masumbillah65@gmail.com